ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1680-1687
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.389

অজ্ঞানতা থেকে আত্মপরিচয়: দলিত ও নারী চেতনার জাগরণে ফুলের দর্শন

সংযুক্তা পান, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 27.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This article focuses on the life philosophy and social reform struggles of the nineteenth-century reformers Jyotirao Phule and Savitribai Phule. The central inquiry of the paper is to examine how so-called religious and social "ignorance" binds marginalized communities within chains of oppression, and how education and rational consciousness enable them to attain a strong sense of "identity." Drawing upon Jyotirao Phule's seminal work Gulamgiri and Savitribai Phule's Kavya Phule, the article analyzes the awakening of Dalit and women's consciousness.

The study demonstrates that Phule's philosophy was not limited to mere literacy; rather, it represented a structural revolution that built a powerful resistance against the parallel systems of oppression—caste hierarchy and patriarchy. Finally, the paper discusses the continuing relevance of this philosophy in the context of contemporary social and gender inequalities in India.

Keywords: Jyotirao Phule, Savitribai Phule, Dalit Consciousness, Education and Social Reform, Caste and Gender Inequality

উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণের ইতিহাসে জ্যোতিরাও ফুলে এবং সাবিত্রীবাই ফুলের আবির্ভাব কোনো সাধারণ সমাজসংস্কার ছিল না, বরং তা ছিল একটি বৈপ্লবিক কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচনা। সচরাচর যে নবজাগরণকে আমরা উচ্চবর্ণের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা হিসেবে দেখি, ফুলের দর্শন ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ভূমিঘেঁষা, প্রান্তিক এবং সরাসরি শোষণের মূলে আঘাতকারী। এই দর্শনের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'অজ্ঞানতা' বা 'অবিদ্যা'র বিলোপ ঘটিয়ে এক বলিষ্ঠ 'আত্মপরিচয়' (Identity) গড়ে তোলা। জ্যোতিরাও ফুলে গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের বর্ণাশ্রম প্রথা এবং পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেবল গায়ের জোরে নয়, বরং নিচুতলার মানুষের মনে এক গভীর হীনম্মন্যতা ও অজ্ঞানতা গেঁথে দিয়ে টিকে আছে। ফুলে জানতেন যে, এই দাসত্বের জিঞ্জির ভাঙার একমাত্র চাবিকাঠি হলো জ্ঞান। তাঁর বিখ্যাত শ্লোকে তিনি স্পষ্ট করেছিলেন যে:

> "বিদ্যার বিনা মতি গেল, মতির বিনা নীতি গেল, নীতির বিনা গতি গেল, গতির বিনা বিত্ত গেল এবং অবশেষে বিত্তহীন শূদ্ররা ধ্বংস হলো"[১]

অর্থাৎ, অজ্ঞানতাই দারিদ্র্য এবং সামাজিক শোষণের মূল উৎস। ফুলে দম্পতি অনুভব করেছিলেন যে, নারী ও দলিতদের বঞ্চনার ধরণ আলাদা হলেও শোষণের উৎস একই—পিতৃতন্ত্র এবং বর্ণপ্রথা। ১৮৪৮ সালে পুণের ভিড়ে ওয়াডায় যখন তাঁরা ভারতের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন সাবিত্রীবাই ফুলে কেবল জ্যোতিরাওয়ের স্ত্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক। প্রথম ভারতীয় মহিলা শিক্ষিকা হিসেবে যখন তিনি স্কুলে যেতেন, তখন মানুষ তাঁর ওপর কাদা এবং গোবর ছুড়ে মারত। সাবিত্রীবাই অপমানের প্রতিবাদ জানাতেন অটল ধৈর্যের মাধ্যমে। তিনি রক্ষণশীলদের উদ্দেশ্যে বলতেন:

> "আমার ভাইরা, তোমরা যে ঢিল বা গোবর আমার ওপর ছুড়ছো, তা আমার কাছে ফুলের মতো। কারণ এটি আমাকে আমার বোনের সেবায় আরও উৎসাহিত করছে"[২]

সাবিত্রীবাই তাঁর 'কাব্য ফুলে' কাব্যে লিখেছিলেন:

> "জেগে ওঠো, শিক্ষিত হও এবং নিজের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলো"[৩]

তাঁর এই আহ্বান ছিল সরাসরি আত্মপরিচয় খোঁজার লড়াই।

১৮৪৮ সালে এক উচ্চবর্ণের বন্ধুর বিয়েতে যোগ দিতে গিয়ে জ্যোতিরাও চরম জাতপাতভিত্তিক অপমানের শিকার হন, যা তাঁর দর্শনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এই ব্যক্তিগত লাঞ্ছনা তাঁকে শিখিয়েছিল যে, বর্ণবাদ আসলে মানুষের আত্মসম্মানকে ধ্বংস করার এক হাতিয়ার। এই ক্ষোভ থেকেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'গুলামগিরি' (১৮৭৩) রচনা করেন। এই গ্রন্থে ফুলে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, কোনো জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘকাল পরাধীন রাখতে হলে তার ইতিহাস বিকৃত করা এবং তাকে শিক্ষা থেকে দূরে রাখা অপরিহার্য। এই গ্রন্থে ফুলে অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে দেখিয়েছেন যে, কোনো জনগোষ্ঠীকে দাসত্বের জিঞ্জিরে আবদ্ধ রাখার প্রধান অস্ত্র হলো তাকে ইতিহাস ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখা। তিনি 'গুলামগিরি' বা দাসত্ব বলতে কেবল শারীরিক পরাধীনতাকে বোঝাননি, বরং এটি ছিল এক ধরনের মানসিক ও ধর্মীয় দাসত্ব, যা উচ্চবর্ণের চাতুরীর মাধ্যমে নিম্নবর্ণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফুলে এই গ্রন্থে আর্য আক্রমণ তত্ত্বের এক নিজস্ব বয়ান তৈরি করেন, যেখানে তিনি দাবি করেন যে এদেশের আদিবাসীরাই (শূদ্র ও অতি-শূদ্র) ছিলেন প্রকৃত বীর এবং ভূস্বামী, যাঁদের চাতুর্য ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে আর্যরা দাসে পরিণত করেছিল। তিনি ধর্মের নামে প্রচলিত পুরাণ ও অবতারতত্ত্বকে যুক্তির তুলাদণ্ড দিয়ে বিচার করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, এগুলি আসলে উচ্চবর্ণের আধিপত্য বজায় রাখার কাল্পনিক আখ্যান মাত্র।

'গুলামগিরি' গ্রন্থে ফুলে যে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার কথা বলেছিলেন, তা ছিল দলিত ও নারীদের সামাজিক পতনের মূল কারণ। তিনি এক অমর শ্লোকে ব্যক্ত করেছিলেন যে, বিদ্যার অভাবে বুদ্ধি নাশ হয়, বুদ্ধির অভাবে নীতি হারায়, আর নীতির অভাবে উন্নয়ন থমকে যায়—যার ফলে শূদ্ররা সম্পদহীন ও ধ্বংসের মুখে পড়ে। তাঁর মতে, শিক্ষা কেবল অক্ষরজ্ঞান নয়, বরং তা হলো নিজের শিকড় চেনার এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী মিথ্যে সংস্কার বা 'False Consciousness' ভেঙে ফেলার প্রধান হাতিয়ার, এসম্পর্কে সাবিত্রীবাই-এর উক্তি আজও প্রাসঙ্গিক তা হল:

> "যাও শিক্ষা নাও, স্বনির্ভর হও, অলস হয়ে থেকো না, জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করো"[৪]

ফুলে দম্পতি অনুভব করেছিলেন যে, লিঙ্গবৈষম্য এবং বর্ণবৈষম্য একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, তাই তাঁদের লড়াই ছিল এই দুই শোষণের বিরুদ্ধেই সমান্তরাল। এই লড়াইয়ের প্রথম এবং প্রধান ব্যবহারিক ধাপ ছিল শিক্ষা। ১৮৪৮ সালে পুণের ভিড়ে ওয়াডায় যখন জ্যোতিরাও ও সাবিত্রীবাই ভারতের প্রথম বালিকা

বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তা কেবল একটি পাঠশালা ছিল না, বরং তা ছিল প্রচলিত রক্ষণশীল সমাজের মূলে এক প্রচণ্ড আঘাত। সাবিত্রীবাই ফুলে নিজে শিক্ষিত হয়ে প্রথম ভারতীয় মহিলা শিক্ষিকা হিসেবে যখন স্কুলে যেতেন, তখন তাঁকে অবর্ণনীয় লাঞ্ছনা সহ্য করতে হতো। রক্ষণশীলরা তাঁর গায়ে কাদা এবং গোবর ছুড়ে মারত, কিন্তু তিনি দমে যাননি। এই ধৈর্য এবং লড়াই ছিল ফুলের দর্শনের বাস্তব প্রতিফলন। তাঁরা জানতেন যে, নারী শিক্ষিত না হলে একটি সমাজ কখনোই অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি পেতে পারে না। ফুলের মতে, সমাজে শোষণ ও বৈষম্যের মূল কারণ হলো অজ্ঞানতা। তিনি মনে করতেন যে, শিক্ষা মানুষকে তার প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে সচেতন করে এবং তাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তোলে।তিনি বলেন:

> "Without education, wisdom was lost; without wisdom, morals were lost; without morals, development was lost; without development, wealth was lost; without wealth, the Shudras were ruined."[৫]

এই উক্তির মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়, বরং সামাজিক মুক্তির জন্য অপরিহার্য।

এই সামাজিক রূপান্তরের লক্ষ্যে ১৮৭৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'সত্যশোধক সমাজ', যার মূল মন্ত্র ছিল সত্যের অনুসন্ধান এবং মানুষের ওপর মানুষের শোষণ বন্ধ করা। এই সমাজের প্রধান নিয়মাবলী ছিল বৈপ্লবিক; এখানে ঘোষণা করা হয়েছিল যে সমস্ত মানুষই এক স্রষ্টার সন্তান এবং জন্মগতভাবে সবাই সমান। সত্যশোধক সমাজের অনুসারীদের জন্য কোনো মধ্যস্থতাকারী বা পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা হয়েছিল। সত্যশোধক সমাজের সদস্যদের প্রতি তাঁর প্রধান আহ্বান ছিল:

> "নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো এবং অন্যের গোলামি করো না"[৬]

ফুলের দর্শনে প্রার্থনা ছিল সরাসরি স্রষ্টার সাথে সংযোগ, যেখানে কোনো জটিল ধর্মীয় আচার বা উপঢৌকনের স্থান ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা রাখে এবং ধর্ম কখনোই যুক্তিহীন হওয়া উচিত নয়। এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি শিখিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী বা পুরোহিতের প্রয়োজন নেই। এই ঘোষণাটি ছিল দলিতদের জন্য এক বিরাট মনস্তাত্ত্বিক মুক্তি, কারণ এটি তাদের হীনম্মন্যতা দূর করে নিজেদের অস্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখিয়েছিল। ফুলের দর্শনে কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা ছিল না, ছিল প্রত্যক্ষ সক্রিয়তা। তৎকালীন সময়ে দলিতদের জন্য সর্বসাধারণের জলাশয় ব্যবহার যখন নিষিদ্ধ ছিল, তখন জ্যোতিরাও নিজের বাড়ির জলের ট্যাঙ্ক দলিতদের জন্য খুলে দিয়ে জাতপাতের অস্পৃশ্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। ফুলে ভারতীয় বর্ণব্যবস্থাকে একটি কৃত্রিম ও শোষণমূলক কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর গ্রন্থ '*Gulamgiri*' (১৮৭৩)-তে তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন এবং দলিতদের ঐতিহাসিক শোষণের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি লিখেছেন:

> "The Brahmins have made the Shudras and Atishudras ignorant and have thus enslaved them."[৭]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি দেখান যে শোষণের মূল অস্ত্র ছিল জ্ঞানের উপর একচেটিয়া অধিকার।

তেমনিভাবে বিধবা বিবাহ এবং কুমারী মাতাদের আশ্রয় প্রদানের মাধ্যমে সাবিত্রীবাই প্রমাণ করেছিলেন যে, নারীর আত্মপরিচয় কেবল তার শরীরের পবিত্রতা বা সামাজিক স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে না, বরং তার মানবিক মর্যাদাই আসল। তাঁরা অনাথ শিশুদের আশ্রয় দিয়েছেন, মহামারীর সময় আর্তের সেবা করেছেন এবং নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন এক সমমর্যাদার সমাজ গড়তে। 'গুলামগিরি' গ্রন্থে ফুলে যে

তাত্ত্বিক ভিত্তি দিয়েছিলেন, বাবাসাহেব আম্বেদকর যখন পরবর্তীকালে দলিত আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন, তিনি তাকেই পূর্ণতা দান করেন এবং জ্যোতিরাও ফুলেকে তাঁর প্রধান অনুপ্রেরণা ও 'গুরু' হিসেবে স্বীকার করেন। বর্তমান সময়েও যখন আমরা সামাজিক বৈষম্য, নারী নির্যাতন বা প্রান্তিক মানুষের বঞ্চনার কথা বলি, তখন ফুলের দর্শন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রকৃত মুক্তি কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং তা বৌদ্ধিক এবং আধ্যাত্মিক। অজ্ঞানতার শৃঙ্খল ভেঙে যখন একজন দলিত বা একজন নারী নিজের অধিকার এবং মেধা সম্পর্কে সচেতন হন, তখনই সার্থক হয় ফুলের জীবনদর্শন। এই ধারাবাহিক সংগ্রামের পথ ধরেই আজকের দলিত সাহিত্য এবং নারীবাদী আন্দোলনগুলি তাদের শক্তির উৎস খুঁজে পায়। ফুলে এবং তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাই ফুলে ভারতের প্রথম নারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল নারীদের জন্য শিক্ষার দরজা খুলে দেওয়ার একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।সাবিত্রীবাই বলেন:

"Awake, arise and educate, smash traditions—liberate!"[৮]

এই আহ্বান নারী চেতনার জাগরণের একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করে।

পরিশেষে বলা যায়, সাবিত্রীবাইয়ের লেখা পঙক্তিগুলো আজও প্রাসঙ্গিক:

"যাও শিক্ষা নাও, স্বনির্ভর হও, অলস হয়ে থেকো না, জ্ঞান ও তথ্য সংগ্রহ করো"[৯]

জ্যোতিবা ফুলের জীবনদর্শন ও তাঁর অমর সৃষ্টি 'শেতকরয়াচা আসুদ' বা 'কৃষকের চাবুক' আধুনিক ভারতের সমাজ সংস্কার ও কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। জ্যোতিবা ফুলে বিশ্বাস করতেন যে, একটি জাতির প্রকৃত উন্নতি তখনই সম্ভব যখন সেই জাতির কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ শিক্ষিত এবং সচেতন হবে। ১৮৮১ সালে রচিত এই গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তৎকালীন সমাজব্যবস্থা, ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র এবং ধর্মীয় শোষণের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। ফুলের দর্শনের মূলে ছিল শিক্ষার অভাবজনিত অন্ধকার। তিনি মনে করতেন, বিদ্যার অভাবেই কৃষকদের বুদ্ধি বা 'মতি' নষ্ট হয়েছে, যার ফলে তারা সঠিক নীতি নির্ধারণ করতে পারছে না এবং পরিশেষে আর্থিক ও মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ছে। এই গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে অশিক্ষিত কৃষকদের নানা ধর্মীয় আচার ও কুসংস্কারের ভয় দেখিয়ে পুরোহিত শ্রেণি তাদের অর্থ শোষণ করে। আবার অন্যদিকে, সরকারি দপ্তরে উচ্চবর্ণের আধিপত্য থাকায় কৃষকরা আইনি ও প্রশাসনিকভাবেও পদে পদে লাঞ্ছিত হয়। বন বিভাগ থেকে শুরু করে রাজস্ব বিভাগ পর্যন্ত সর্বত্র কৃষকদের ওপর যে জুলুম চলত, ফুলে তাকে সরাসরি আক্রমণ করেছেন।

ফুলের অর্থনৈতিক দর্শনে কৃষকের মুক্তি কেবল খাজনা কমানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন কৃষির আমূল আধুনিকীকরণ। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে, সরকারকে বিশাল বিশাল বাঁধ ও সেচ খাল নির্মাণ করতে হবে যাতে কৃষকদের কেবল বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে থাকতে না হয়। তিনি গবাদি পশুর প্রজনন উন্নত করা এবং কৃষকদের আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শেখানোর ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, কৃষক যদি নিজের উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য না পায় এবং মহাজনদের চড়া সুদের ঋণের জালে বন্দি থাকে, তবে দেশের উন্নতি অসম্ভব। এই গ্রন্থে তিনি তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও সতর্ক করেছিলেন যে, সাধারণ কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন না করে কেবল তাত্ত্বিক স্বাধীনতার কথা বলা অর্থহীন।

জ্যোতিবা ফুলের সার্বিক জীবনদর্শন ছিল মূলত 'সত্যের অনুসন্ধান'। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সত্যশোধক সমাজ'-এর মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন যে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই এবং ঈশ্বর বা 'নির্মিক'-এর কাছে পৌঁছাতে কোনো পুরোহিতের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। তাঁর কাছে মানবতাই ছিল শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তিনি নারী শিক্ষার প্রসার এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের যে লড়াই শুরু করেছিলেন, তার প্রতিফলন আমরা

'শেতকরয়াচা আসুদ' গ্রন্থেও দেখতে পাই। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজ সংস্কার এবং অর্থনৈতিক মুক্তি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। নারী ও নিম্নবর্ণের মানুষ যদি শিক্ষিত না হয়, তবে তারা কখনোই তাদের অধিকার বুঝে নিতে পারবে না। 'কৃষকের চাবুক' কেবল একটি বই নয়, এটি ছিল শোষিত মানুষের মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়ানোর এক দীপ্ত আহ্বান, যা আজও ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

জ্যোতিবা ফুলের জীবনদর্শনের এক মহত্তম ও পরিণত ফসল হলো তাঁর অমর গ্রন্থ 'সার্বজনিক সত্য ধর্মপুস্তক' (The Book of True Religion for All)। ১৮৯১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত এই গ্রন্থটিকে সত্যশোধক আন্দোলনের 'বাইবেল' বা প্রধান পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য করা হয়। এই গ্রন্থে ফুলে চিরাচরিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় ব্যবস্থার পরিবর্তে এক মানবিক ও বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শনের প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ধর্ম কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়, বরং এটি হওয়া উচিত মানুষের কল্যাণের পথ। ফুলের দর্শনে ঈশ্বরকে তিনি 'নির্মিক' বা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সম্বোধন করেছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যদি ঈশ্বর আমাদের সকলের পিতা বা মাতা হন, তবে তাঁর সন্তানদের মধ্যে উচ্চবর্ণ বা নিম্নবর্ণের ভেদাভেদ থাকা অসম্ভব। এই গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে, ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে কোনো মধ্যস্থতাকারী বা পুরোহিতের প্রয়োজন নেই; মানুষ সরাসরি তাঁর সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে পারে।

'সার্বজনিক সত্য ধর্মপুস্তক'-এ ফুলে তেত্রিশটি অধ্যায়ের মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন সামাজিক ও নৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর দর্শনের একটি প্রধান স্তম্ভ ছিল নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কেন সমাজ পুরুষকে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেয় কিন্তু বিধবা নারীদের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য করে? তাঁর মতে, পরিবারে এবং সমাজে নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমান মর্যাদা ও স্বাধীনতা থাকা উচিত। তিনি ধর্মগ্রন্থগুলোর অন্ধ অনুকরণ না করে মানুষের বিবেক ও যুক্তিকে প্রধান্য দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ফুলে মনে করতেন, যে ধর্ম মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় বা অস্পৃশ্যতার নামে অপমান করে, তা কখনোই 'সত্য ধর্ম' হতে পারে না। তাঁর প্রস্তাবিত 'সত্য ধর্ম' হলো এমন এক ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি মানুষ অন্যকে ভাই বা বন্ধুর মতো দেখবে এবং একে অপরের দুঃখে এগিয়ে আসবে।

এই গ্রন্থের ভাষায় এক গভীর সারল্য ও আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায়। ফুলে এখানে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন একটি শোষণমুক্ত সমাজ, যেখানে কোনো মানুষ জন্মপরিচয়ের কারণে অবজ্ঞাত হবে না। তাঁর দর্শনে সত্যের অনুসন্ধানই হলো শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তিনি সমাজকে সতর্ক করেছিলেন যে, যতক্ষণ না আমরা বর্ণবৈষম্য এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হচ্ছি, ততক্ষণ আমাদের জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। 'সার্বজনিক সত্য ধর্মপুস্তক' আসলে কেবল একটি ধর্মীয় বই নয়, এটি একটি সামাজিক বিপ্লবের ইশতেহার। এটি আমাদের শেখায় যে, সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলা এবং আর্তের সেবা করাই হলো পরম ধর্ম। আজ দেড়শ বছর পরেও তাঁর এই উদার ও মানবিক দর্শন আমাদের এক সুন্দর ও সমতাভিত্তিক সমাজ গড়ার অনুপ্রেরণা জোগায়।

জ্যোতিবা ফুলে রচিত 'ব্রাহ্মণাঞ্চে কসব' (Priestcraft Exposed) বা 'পুরোহিততন্ত্রের পর্দাফাঁস' ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত একটি অত্যন্ত সাহসী ও বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ। এই পুস্তিকায় ফুলে তৎকালীন হিন্দু সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে থাকা পুরোহিততন্ত্রের শোষণ ও চাতুর্যের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তাঁর জীবনদর্শনের অন্যতম প্রধান শত্রু ছিল সেই ব্যবস্থা, যা ধর্মের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে মানসিকভাবে

পরাধীন করে রাখে। এই গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষায় দেখিয়েছেন কীভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে পুরোহিতরা সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জনের পথ তৈরি করে নিয়েছে।

ফুলের মতে, পুরোহিততন্ত্র কেবল একটি পেশা নয়, এটি ছিল একটি সুসংগঠিত শোষণের যন্ত্র। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ঈশ্বর যদি সবার পিতা হন, তবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করার জন্য কোনো নির্দিষ্ট মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন কেন হবে? 'ব্রাহ্মণাঞ্চে কসব' গ্রন্থে তিনি হিন্দুদের বিভিন্ন সংস্কার যেমন—বিবাহ, শ্রাদ্ধ, গৃহপ্রবেশ এবং ব্রত-পার্বণের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে সাধারণ মানুষকে নরকের ভয় বা পাপের ভয় দেখিয়ে তিল তিল করে সর্বস্বান্ত করা হয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ধর্মের এই বাহ্যিক আড়ম্বর আসলে নিম্নবর্ণের মানুষ এবং নারীদের অবদমিত রাখার এক কৌশল। ফুলে মনে করতেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এই মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত না হবে, ততক্ষণ তাদের প্রকৃত সামাজিক বা রাজনৈতিক মুক্তি সম্ভব নয়।

এই গ্রন্থের দর্শনে 'যুক্তি' এবং 'বিবেক' ছিল প্রধান হাতিয়ার। ফুলে পাঠকদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন প্রশ্ন করতে। তিনি বলেছিলেন, কোনো ধর্মগ্রন্থ যদি মানুষের অবমাননা করে বা কাউকে অস্পৃশ্য বলে ঘোষণা করে, তবে তা কখনোই ঈশ্বরের বাণী হতে পারে না। তিনি পুরোহিতদের তৈরি 'মন্ত্র' এবং 'অনুষ্ঠানের' আড়ালে লুকিয়ে থাকা ব্যবসায়িক স্বার্থকে জনসমক্ষে নিয়ে আসেন। তাঁর মতে, প্রকৃত ধর্ম হলো অন্তরের ভক্তি এবং সৎ কর্ম; এর জন্য কোনো দামি উপাচার বা সংস্কৃত মন্ত্রের প্রয়োজন নেই যা সাধারণ মানুষ বুঝতেই পারে না। তিনি ভাষার এই জটিলতাকেও শোষণের একটি অস্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।
'ব্রাহ্মণাঞ্চে কসব' কেবল একটি সমালোচনা গ্রন্থ ছিল না, এটি ছিল একটি জাগরণী গান। এই বইয়ের মাধ্যমে ফুলে সাধারণ মানুষকে আত্মমর্যাদা শিখিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মানুষ যেন নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ধর্মের নামে চলা এই প্রহসন বন্ধ করে। তিনি কৃষকদের এবং সাধারণ শ্রমজীবী মানুষকে সচেতন করেছিলেন যেন তারা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ এই অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানে ব্যয় না করে সন্তানদের শিক্ষার পেছনে ব্যয় করে। জ্যোতিবা ফুলের এই গ্রন্থটি ভারতীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনে এক মশাল হিসেবে কাজ করেছিল, যা আজও আমাদের শেখায় যে—অন্ধবিশ্বাসমুক্ত মনই হলো প্রকৃত স্বাধীনতার প্রথম ধাপ।

জ্যোতিবা ফুলে রচিত 'ইশারা' (Warning) ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং দূরদর্শী প্রবন্ধ। এটি কেবল একটি পুস্তিকা নয়, বরং তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বকে দেওয়া এক অমোঘ সতর্কবার্তা। এই গ্রন্থের মাধ্যমে ফুলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা এবং সাধারণ কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত মুক্তি নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত দর্শন ব্যক্ত করেছেন।

ফুলের জীবনদর্শনের একটি প্রধান দিক ছিল 'অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ'। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলো মূলত উচ্চবর্ণের শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল। 'ইশারা' গ্রন্থে তিনি অত্যন্ত সাহসের সাথে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, যে আন্দোলনে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক, মালি, ধাঙর এবং অতি-শূদ্রদের কোনো অংশগ্রহণ নেই, সেই আন্দোলন কীভাবে 'জাতীয়' হতে পারে? তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে গেলেও যদি ক্ষমতা কেবল মুষ্টিমেয় উচ্চবর্ণের হাতে কুক্ষিগত থাকে, তবে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। একে তিনি 'ব্রাহ্মণ্যবাদী আধিপত্যের পুনরুত্থান' হিসেবে ভয় পেতেন।

এই গ্রন্থে ফুলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের এক চমৎকার সমন্বয় দেখা যায়। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়েও সামাজিক সমতা এবং জাতিভেদ প্রথা বিলোপ করা বেশি জরুরি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, জাতিভেদ প্রথা বজায় রেখে কোনো জাতি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। তিনি উচ্চবর্ণের নেতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন যেন তারা আগে নিজেদের ঘর সংস্কার করেন, অস্পৃশ্যতা দূর করেন এবং কৃষকদের অধিকার স্বীকার করেন। ফুলে মনে করতেন, কৃষকের ঘাম ও শ্রমের ওপর দাঁড়িয়ে যারা বিলাসিতা করে, তাদের মুখে দেশপ্রেমের কথা মানায় না।

'ইশারা' বইটিতে ফুলে এক গভীর মানবিক দর্শনের কথা বলেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রকৃত দেশপ্রেম হলো দেশের প্রতিটি মানুষের প্রতি ভালোবাসা। তিনি কৃষকদের দুরবস্থা এবং অশিক্ষার কথা বারবার মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে, যতক্ষণ না পর্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ শিক্ষিত হচ্ছে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, ততক্ষণ যেকোনো রাজনৈতিক আন্দোলন হবে কেবল ওপরতলার মানুষের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার। তিনি চেয়েছিলেন এক এমন সমাজ যেখানে কৃষক কেবল কর দাতা হবে না, বরং হবে দেশের প্রকৃত অংশীদার।

জ্যোতিবা ফুলের 'ইশারা' ছিল এক অন্ধকার সময়ের মশাল। এটি আমাদের শেখায় যে, সাম্য ও ন্যায়বিচার ছাড়া স্বাধীনতা অর্থহীন। আজকের গণতান্ত্রিক ভারতেও ফুলের এই 'ইশারা' বা সতর্কবার্তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক; কারণ এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, উন্নয়নের সুফল যতক্ষণ না সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ জাতির মুক্তি অসম্পূর্ণ।

ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে বর্ণভেদ ও লিঙ্গবৈষম্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল সমাজের একটি বৃহৎ অংশ— দলিত ও নারী সম্প্রদায়। এই অবদমিত মানুষের মুক্তি, আত্মসম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে কয়েকজন মহাপুরুষ পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে জ্যোতিরাও ফুলে অন্যতম। তাঁর দর্শন ও চিন্তাধারা দলিত ও নারী চেতনার জাগরণে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল।

প্রথমত, ফুলে উপলব্ধি করেছিলেন যে সমাজের মূল সমস্যা নিহিত আছে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের মধ্যে। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা হলো মুক্তির একমাত্র পথ। সেই কারণেই তিনি দলিত ও নারী শিক্ষার প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি শুধু শিক্ষার আলো ছড়ায়নি, বরং দলিত ও নারীদের আত্মসম্মান ও আত্মপরিচয়ের বোধ জাগ্রত করেছিল। তাঁর স্ত্রী সাবিত্রীবাই ফুলে এই আন্দোলনের অগ্রণী সৈনিক ছিলেন, যিনি নারী শিক্ষার পথিকৃৎ হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

দ্বিতীয়ত, ফুলের দর্শনে সামাজিক সাম্য ও মানবিক মর্যাদার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদী সামাজিক কাঠামোর তীব্র সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, জন্ম নয়, কর্মই মানুষের প্রকৃত পরিচয়। তাঁর মতে, সমাজের প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার থাকা উচিত। এই চিন্তাধারা দলিতদের মধ্যে আত্মমর্যাদার বোধ জাগিয়ে তোলে এবং তাদের সামাজিক শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করে।

নারী চেতনার জাগরণেও ফুলের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি নারীদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হওয়ার ওপর জোর দেন। তাঁর মতে, নারী যদি শিক্ষিত হয়, তবে একটি পরিবার এবং পরবর্তীতে পুরো সমাজ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। তিনি বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা এবং বিধবাদের প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁর চিন্তাধারা নারীদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে এবং তাদের আত্মনির্ভরশীলতার পথে এগিয়ে দেয়।

সবশেষে বলা যায়, ফুলের দর্শন শুধুমাত্র একটি সামাজিক আন্দোলনের ভিত্তি নয়, বরং এটি একটি মানবিক ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা, যা আজও প্রাসঙ্গিক। দলিত ও নারী চেতনার জাগরণে তাঁর অবদান

ভারতীয় সমাজকে নতুন আলো দেখিয়েছে। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই একটি সাম্যভিত্তিক, ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। ফুলের দর্শন কোনো বিশেষ সময়ের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সমতা ও ন্যায়বিচারকামী প্রতিটি মানুষের জন্য চিরকালীন এক আলোকবর্তিকা, যা আজও আমাদের শেখায় কীভাবে অন্ধবিশ্বাসের কুয়াশা কাটিয়ে সত্যের আলোয় নিজের আত্মপরিচয় খুঁজে নিতে হয়।

তথ্যসূত্র:

১. Phule, Jyotirao Govindrao. *Gulamgiri*. 1873, Page-24.
২. Keer, Dhananjay. *Mahatma Jotirao Phooley: Father of Our Social Revolution*. Popular Prakashan, 1964. Page-32.
৩. Phule, Savitribai. *Kavya Phule (Poetry Blossoms)*. Translated into English, Various Editions. Page-12.
৪. Phule, Savitribai. *Kavya Phule (Poetry Blossoms)*. Translated into English, Various Editions. Page-45.
৫. Phule, Jyotirao Govindrao. *Gulamgiri*. 1873, Page-42.
৬. Deshpande, G. P., editor. *Selected Writings of Jotirao Phule*. LeftWord Books, 2002. Page-78.
৭. Phule, Jyotirao Govindrao. *Gulamgiri*. 1873, Page-44.
৮. Phule, Savitribai. *Kavya Phule (Poetry Blossoms)*. Translated into English, Various Editions. Page-16.
৯. Phule, Savitribai. *Kavya Phule (Poetry Blossoms)*. Translated into English, Various Editions. Page-45.